তারিখ ... 23 JUL 1977 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বনাম

ইসলামী শিক্ষার ভবিষ্যৎ

আ, ফ, ম, খালিদ হোসেন

১৩৭৯ সনের ১১ শ্রাবণ (১৯৭২ খৃষ্টাব্দের ২৬ জুলাই) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এক প্রস্তাবানুযায়ী বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে ১৮ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর এ শিক্ষা কমিশনের উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী তার উদ্দীপনাময় উদ্বোধনী ভাষণে কমিশনের সদস্যগণকে ব্যাংলাদেশের জনগণের 'বাঞ্ছিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির জন্য' পুনর্গঠিত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে তাদের সুচিন্তিত পরামর্শদানের আহবান জানান।

প্রধানমন্ত্রীর এ আহবানে সাড়া দিয়ে কমিশনের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সনে ভারতে বিভিন্ন রাজ্য সফর করেন। সরকারী প্রস্তাবের নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৭৩ সালের ৮ জুন অন্তর্বর্তীকালীন এবং ১৯৭৪ সালের ৩০ মে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করা হয়। শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের ভূমিকায় বলা হয়েছে, 'এই রিপোর্ট গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী মহোদয় সন্তোষ প্রকাশ করেন' কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রিপোর্ট গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ১৫ মাস জীবিত থাকা সত্ত্বেও এ রিপোর্ট বাস্তবায়নের কোন পদক্ষেপ নেননি।

ডঃ কুদরাত-এ খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের ১ম অধ্যায়ে 'শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী' শিরোণামে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, "বাঞ্ছিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যে আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ শিক্ষার্থীদের চিত্তে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে হবে। এবং তার বাস্তব জীবনে যাতে এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।" উপরোক্ত বক্তব্য স্পষ্টত ঘোষণা করে যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কর্মীবাহিনী তৈরী এবং তৎকালীন সংবিধানে বর্ণিত নীতিমালা চতুষ্টয়ের লালন ও বিকাশের মাধ্যমে একটি ধর্মীয় আদর্শ বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত গড়ে তোলাই এ শিক্ষা কমিশনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্ট সুস্পষ্টভাবে ধর্মীয় শিক্ষাকে সংকুচিত করা হয়েছে। কমিশন ৯০টি প্রশ্ন সম্বলিত ৯৫৫৯ জন শিক্ষাবিদ, কৃষিবিদ, শিক্ষা প্রশাসক, ছাত্র সংসদ নেতা ও জাতীয় সংসদ সদস্যের কাছে প্রেরণ করেন। প্রশ্নমালা যাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল তাদের ৯৫% ছিলেন তৎকালীন সরকারী দলের লোক বা সমর্থক।

১৯৭৩-১৯৭৪ সালের বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ধর্ম শিক্ষাকে পাঠ্য ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি এটা নিছক পরিহাস ও অবিমৃশ্যকারিতা ছাড়া আর কিছু নয়। ইসলামের প্রতি এটা চরম অবজ্ঞা ও চূড়ান্ত অবমাননার শামিল। আসলে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন ইসলামী আদর্শ বিরোধী এক কালো দলিল। এ রিপোর্ট তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের আদর্শিক দৈন্যতার এক জলন্ত প্রতিচ্ছবি। এখানে সঙ্গতভাবে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, কেন কমিশনের সদস্যরা নিম্নতম স্তরে ধর্ম শিক্ষা রাখার পক্ষপাতী নন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ভারতীয় উপমহাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষাই ছিল এদেশের একটি জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা। ইংরেজ শাসন-শোষণ চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে বৃটিশরা ইসলামী শিক্ষাকে সমূলে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে লর্ড মেকলের মাধ্যমে সেক্যুলার শিক্ষা প্রবর্তন করেন। বৃটিশ রাজশক্তির অনুগত বাহিনী সৃষ্টির লক্ষ্যে ইংরেজী স্কুল ও কলেজ গড়ে তোলা হয় সর্বত্র। নানা সংস্কার আইন ও বিধি প্রণয়নের বেড়াজালে আটকা পড়ে মাদ্রাসা তথা ইসলামী শিক্ষা অনেকটা অস্তিত্বহীন হয়ে দাঁড়ায়। শত বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এ দেশের সংগ্রামী ওলামা-মাশায়েখ নিজেদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, মেধা ও শ্রমের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষাকে টিকিয়ে রেখেছেন।

কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে এ শিক্ষার মাথায় যে খড়গ চালানো হয়েছে, তাতে মাদ্রাসার দেহে প্রাণ থাকবে কি-না যথেষ্ট সন্দেহ। ডঃ কুদরাত-এ-খুদা রচিত শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের ১১ অধ্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক যেসব কথা বলা হয়েছে তা মূলতঃ আলীয়া লাইন প্রসঙ্গে। বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ১৯৯৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রাথমিক (এদাদী) থেকে স্নাতকোত্তর (দাওরায়ে হাদীস) স্তর পর্যন্ত কাওমী মাদ্রাসার সংখ্যা ৫,৫০০। তন্মধ্যে মাধমিক (ছানবী) ও স্নাতকোত্তর স্তরের ১০০টি বালিকা মাদ্রাসাসহ উচ্চ স্তরের বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মাদ্রাসা।

টোল শিক্ষা' শীর্ষক একটি অধ্যায় সংযোজন করেন, যা কার্যত ইসলামী শিক্ষার প্রতি বেআদবীর নামান্তর। মাদ্রাসা শিক্ষা ও টোল শিক্ষা কোনক্রমে তুলনাযোগ্য একই অবস্থানে আসতে পারে না। এ রিপোর্ট যখন প্রণীত হয় তখন মাদ্রাসার' সংখ্যা ছিল ১৪১২টি। ছাত্র ও শিক্ষকসংখ্যা যথাক্রমে ৪ লাখ ও ১৪ হাজার। অথচ টোল শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের কোন জাতীয় পরিসংখ্যান নেই। রিপোর্টে ৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, "মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি অনেকটা একদেশদর্শী, কেননা সকল শিক্ষার্থীকেই ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা প্রদান করা মাদ্রাসার লক্ষ্য।" অথচ গোটা দুনিয়ায় বিশেষায়িত শিক্ষার (Specialised Education) গুরুত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। চিকিৎসা, কৃষি ও প্রকৌশল বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জনের বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি। সঙ্গত কারণে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে ডঃ কুদরাত-এ-খুদার শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে 'মাদ্রাসা শিক্ষার আমূল সংস্কার ও যুগোপযোগী পুনর্গঠন' প্রক্রিয়ার যে নজির আমরা উপরোক্ত অধ্যায়ে দেখেছি তার ওপর নির্ভর করে আমরা নির্দ্বিধায় মন্তব্য করতে পারি যে, এটা ধর্মীয় শিক্ষাকে সামগ্রিকভাবে অনাবশ্যক গণ্য করে কালান্তরে এর অস্তিত্ব বিনাশ করে দিবে। লর্ড মেকলে বা ওয়ারেন হেস্টিংস যা করেননি বা করতে পারেননি এ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তা পুরোপুরি কার্যকর

সরকারের কাছে আমরা সুপারিশ করছি– বর্তমানে গঠিত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি অবিলম্বে বাতিল করে এ দেশের প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদ, জাতীয় সংসদ সদস্য, প্রশাসক ও বিজ্ঞ আলেমে দ্বীনের সমন্বয়ে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীল একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হোক। যে কমিশন উত্তরাধিকার ঐতিহ্য, যুগ চাহিদার প্রেক্ষিত, আদর্শিক মূল্যবোধ ও জনগণের আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ হবেন। আমাদের শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হতে হবে এমন একদল দক্ষ ও যোগ্য জনশক্তি গড়ে তোলা, যারা পবিত্র সংবিধানের ভাষায় আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের অধিকারী। যারা হবে জাতীয় চেতনার বিকাশের অগ্রসেনানী এবং দেশ, জাতি ও দ্বীনের সার্বিক কল্যাণে নিবেদিত প্রাণশক্তি।

'ধর্মশিক্ষা বিভাগ'।

তাতে ঐচ্ছিক বি

বিভাগের জন্য যেসব বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে– কৃষি বিভাগ ৬টি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগ ১০টি, ললিতকলা বিভাগ ১১টি, শিক্ষা বিভাগ-১৩টি, আর ধর্মশিক্ষার বেলায় শুধু বলা হয়েছে ঃ "ধর্ম বিভাগ ঃ ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ প্রস্তাবিত কারিকুলাম ও সিলেবাস কমিটি নির্ধারণ করবে।"

ডঃ কুদরাত-এ-খুদার শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে 'মাদ্রাসা শিক্ষার আমূল সংস্কার ও যুগোপযোগী পুনর্গঠন' প্রক্রিয়ার যে নজির আমরা উপরোক্ত অধ্যায়ে দেখেছি তার ওপর নির্ভর করে আমরা নির্দ্বিধায় মন্তব্য করতে পারি যে, এটা ধর্মীয় শিক্ষাকে সামগ্রিকভাবে অনাবশ্যক গণ্য করে কালান্তরে এর অস্তিত্ব বিনাশ করে দিবে। লর্ড মেকলে বা ওয়ারেন হেস্টিংস যা করেননি বা করতে পারেননি এ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তা পুরোপুরি কার্যকর ব্যবস্থা নির্ধারণের পূর্ণ এখতিয়ার একমাত্র আমাদের। কোন দেশ প্রাচ্য বা প্রতীচ্যের অন্ধ অনুসরণ যেমন আমরা করব না তেমনি অন্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কিছু গ্রহণ করব না, এমন অহেতুক জিদও আমাদের থাকবে না। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হবে জাতীয় চেতনা থেকে উৎসারিত।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডীন ডঃ এরশাদুল বারী বলেন, "আধ্যাত্মিক, মানবিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিই শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থায়ও ধর্মের স্থান নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডঃ কাজী দ্বীন মুহম্মদ বলেন, "ধর্মীয় শিক্ষা তুলে নিলে মানুষ ধর্মবিমুখ, জীবনবিমুখ ও সমাজবিমুখ হয়ে পড়বে। শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দায়িত্ব যাকে তাকে দিলেই হবে না। শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদদের সমন্বয়েই তা করতে হবে। জনগণের বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এমন কোন শিক্ষানীতি আমরা মানব না।"

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ বলেন, "যে কোন দেশের জন্য শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হলে সে দেশের বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে সামনে রাখতে হবে। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের সাথে এ দেশের মানুষের বিশ্বাসের কোন সম্পর্ক নেই।"

দৈনিক ইনকিলাবের ফিচার সম্পাদক ভাষা প্রণয়ন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদে শামসুল হক। ক্ষমতাসীন দলের পছন্দমাফিক বাছাইকৃত সদস্যদের অনেকের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার সাথে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চিন্তা-চেতনার সাথে মিল নেই। দলীয় বুদ্ধিজীবী দিয়ে আদর্শ ও সর্বজনগ্রাহ্য জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও শিক্ষা সংস্কার কঠিন ব্যাপার। কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শামসুল হক বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা থাকাকালীন ধর্মীয় শিক্ষা সংকোচনের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক শ্রেণীতে ১০০ নম্বরের ইসলামিয়াত ৫০ নম্বরে নামিয়ে এনেছিলেন। কমিশনের অন্যতম সদস্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আলী আজগর সাম্প্রতিককালে ধর্মীয় শিক্ষা, মাদ্রাসা ও স্বয়ং বিশ্বনবী (সাঃ) সম্পর্কে যে মারাত্মক, আপত্তিকর ও ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন তাতে পুরো দেশে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন শুরু হয়েছে।

৫৪ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটিতে মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছাড়া কোন ইসলামী পণ্ডিত, ইসলামী শিক্ষা বিশেষজ্ঞ বা বিজ্ঞ আলিমকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান সরকারী আমলা হওয়ার কারণে সরকারী নির্দেশনা ও নীতিমালার বাইরে স্বাধীনভাবে মতামত পেশ করাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সুতরাং এসব বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদের দ্বারা প্রণীতব্য শিক্ষানীতি কতটুকু আদর্শভিত্তিক ও জাতীয় চেতনার পরিপূরক হবে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। এদেশে সরকারের নির্দেশে বহু শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে এবং এসব কমিশন সরকারের কাছে তাদের রিপোর্টও পেশ করেছিলেন, কিন্তু সব রিপোর্ট বাদ দিয়ে শুধু ডঃ কুদরাত-এ-খুদার শিক্ষা কমিশনকে কেন্দ্র করে শিক্ষানীতি প্রণয়ন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

ডঃ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট জাতীয় সংবিধান পরিপন্থী একটি কালো দলিল। কারণ বর্তমান সংবিধানে 'সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা' নামে কোন মূলনীতি অবশিষ্ট নেই। এ রিপোর্টে জাতীয় আশা-আকাংক্ষা ও আদর্শিক মূল্যবোধের ছাপ অনুপস্থিত। ফলে এটা গণবিচ্ছিন্ন, সেকেলে, পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর চিন্তার ফসল। ২৩ বছর পর Deep freezer থেকে বের করে এ মৃত শিক্ষা রিপোর্টকে যুগোপযোগী নামে প্রাণসঞ্চার করার প্রয়াস কতটুকু রাজনৈতিক দূরদর্শিতা প্রসূত ও বাস্তবভিত্তিক তা সচেতন নাগরিক মাত্রই বুঝেন।